بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)- এর ৩০শে জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (সূরা আল বাকারা: ২৮৭) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা কারো ওপর সাধ্যাতীত দায়িত্বভার অর্পণ করেন না। এ বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা এটি সুস্পষ্ট করেছেন যে, তিনি এমন কোন নির্দেশ দেন না যা পালন করা মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে, তার সামর্থ্যের গন্ডির বাইরে, তার যোগ্যতার সীমা বহিঃর্ভূত। অতএব আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যেহেতু এমন নির্দেশ আসে যা পালন করা মানবীয় সাধ্যের বাইরে নয় সেখানে এ সকল নির্দেশ পালন করার দায়িত্বও মানুষের ওপর অর্পিত হয়। একজন প্রকৃত মু'মিন এই অজুহাত দেখাতে পারে না যে, অমুক নির্দেশ পালন করা আমার জন্য সাধ্যাতীত। যদি আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সত্তায় ঈমান থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লার এ কথার ওপরও ঈমান রাখা আবশ্যক যে, তাঁর যত আদেশ বা নির্দেশ রয়েছে এর সবই আমাদের শক্তি এবং সামর্থ্য সম্মত। আর আমাদের উচিত সকল শক্তি এবং সামর্থ্য নিয়োজিত করে তা পালনের চেষ্টা করা। আল্লাহ্ তা'লা এ কথা বলেন নি যে, এই হল নির্দেশ, তোমাদের এটি পালন করে এর সর্বোচ্চ মান অর্জন করতে হবে নতুবা তোমরা শাস্তিযোগ্য হবে, বরং তিনি বলেছেন, তোমাদেরকে প্রদত্ত শক্তি অনুসারে প্রতিটি নির্দেশ পালন করা তোমাদের জন্য আবশ্যক; এটিই ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য। মানবীয় প্রকৃতি বা মানুষের অবস্থা যখন আমরা খতিয়ে দেখি বা বিশ্লেষণ করি তখন বুঝা যায়, প্রত্যেক মানুষের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন। তার মানসিক অবস্থা, তার দৈহিক গঠন, তার জ্ঞান-বুদ্ধি এবং মেধা ভিন্ন ভিন্ন।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা মানুষের দুর্বলতা, তার বিভিন্ন অবস্থা এবং চাহিদা ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে স্বীয় বিধি-নিষেধ এবং শিক্ষামালায় এমন কোমলতা রেখেছেন যে, এর একটি ন্যূনতম মাপকাঠিও আছে আর একটি উচ্চতম মানদন্ডও রয়েছে। অতএব এমন ফ্লেক্সিবিলিটি বা নমনীয়তার নিরিখেই আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, আমার আদেশ-নিষেধ তোমরা সততার সাথে পালন কর, মেনে চল। এই হল, ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষা যা মানব প্রকৃতিকে সামনে রেখে দেয়া হয়েছে। কারো এই আপত্তির সুযোগ রাখেন নি যে, হে আল্লাহ্! তুমি আমার প্রকৃতি এবং আমার অবস্থা এমন বানিয়েছ আর আদেশ-নিষেধ দিয়েছ এর পরিপন্থী। নির্দেশ আমাকে তুমি এটি দিচ্ছ যে, তোমার নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে যেন সর্বোচ্চ মানে উপনীত হই, অথচ আমার দৈহিক অবস্থা এমন যে, আমি এ মাপকাঠি অনুসারে তা পালন করতেই পারি না। বা আমার মেধা এমন নয় অথবা আমার আরও বিবিধ দুর্বলতা রয়েছে যা এই মান অর্জনের পথে অন্তরায়। তাই আমি কীভাবে এসব মেনে চলতে পারি বা পালন করতে পারি? কিন্তু আল্লাহ তা'লা لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا বলে সকল ওজর-আপত্তির দ্বার রুদ্ধ করে

দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় আদেশ-নিষেধ এবং শিক্ষার ওপর আমল করার দায়িত্ব মানুষের ওপর ন্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন, তোমাকে এগুলো মেনে চলতে হবে। কিন্তু এর ন্যূনতম মানদন্ড নির্ধারণ করে যারা এটি পালন না করেও শাস্তি এড়ানোর অজুহাত অন্বেষণ করে তাদের জন্য আপত্তি করার কোন সুযোগ রাখেন নি। বলে দিয়েছেন, তোমাদের অবস্থা অনুযায়ী এই হল মানদন্ড, এতটুকু তো তোমাদের অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, কোন মানুষ যুক্তি বা বিবেক পরিপন্থী কোন কথা মানতে বাধ্য নয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা শক্তি-বৃত্তির সামর্থ্য ও সহ্যের বাহিরে কোন দায়িত্ব মানুষের উপর ন্যস্ত করা হয় নি। لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا এই আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা এমন নয় যা কেউ পালন করতে পারবে না। খোদা তা'লা পৃথিবীতে শরীয়ত এবং আদেশ-নিষেধ এজন্য নাযিল করেন নি যে, স্বীয় বাগ্মিতা বা বাকপটুতা, সৃজনীশক্তি ও আইন প্রণয়নের দক্ষতা এবং মানুষকে ধাঁধায় ফেলার অহংকার প্রদর্শন করবেন বা কঠিন কথা বলে ধাঁধা সৃষ্টির অহংকার করবেন। তিনি (আ.) বলেন, আর এভাবে পূর্বেই এই সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন যে, কোথায় এই বাজে দুর্বল সৃষ্টি মানুষ, আর কোথায় তাদের এসব নির্দেশ মেনে চলা। আল্লাহ্ তা'লা এমন বাজে কাজ করা হতে পবিত্র।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক মানুষকে যে শক্তি-বৃত্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে রেখেছেন সেগুলোর সহ্য শক্তি এবং সামর্থ্য অনুসারে তিনি স্বীয় নির্দেশ মেনে চলার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন মানুষের প্রতি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মত নন যে, স্বীয় প্রভাব-প্রতাপ প্রকাশের জন্য কোন নির্দেশ দিবেন। সেই সকল কর্মকর্তার মত নন যারা অধিনস্তদের কষ্ট দেয়ার জন্য বা বিরক্ত করার জন্য কিছু নির্দেশ দিয়ে থাকে আর তা পালন না করা হলে তাদেরকে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত করে। সত্য কথা হল, নিজ বান্দাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লার রহমত এবং করুণার কোন শেষ নেই। তিনি যে সমস্ত বিষয় মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন মানুষ যদি তা মেনে চলে তাহলে বহুগুণ পুরস্কারে তাকে ভূষিত করেন। আর প্রত্যেক ব্যক্তির সামর্থ্য এবং যোগ্যতা অনুসারে তার কাছে আমল করার বা তা মেনে চলার প্রত্যাশা রাখেন আর অশেষ প্রতিদানে ভূষিত করেন। অতএব এমন খোদা, যিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি এতটাই দয়ালু তাঁর কথা মেনে চলার জন্য মানুষের কি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা উচিত নয়? একজন প্রকৃত মু'মিন অবশ্যই এর জন্য চেষ্টা করবে এবং করা উচিত।

অপর এক জায়গায় لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا -এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, শরীয়তের ভিত্তি হলো কোমলতার ওপর, কঠোরতার ওপর নয়। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে তার সাধ্য এবং সামর্থ্য অনুসারে ব্যবহার করা হবে। শরীয়ত কোমলতা এবং সহজসাধ্যতার সুযোগ দিয়ে থাকে। সুতরাং আল্লাহ তা'লা শক্তি এবং সামর্থ্য অনুসারে আমলের বা কর্মের কথা বলে তুচ্ছাতিতুচ্ছ এবং সর্বোচ্চ মানের কর্মের সীমা নির্ধারণ করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তার মেধা, মানসিক শক্তি আর জ্ঞানগত অবস্থা অনুসারে কাজের গন্ডিও নির্ধারণ করেছেন। অবশ্য মানুষ যদি মানসিকভাবে রোগাক্রান্ত হয় বা পাগল হয়ে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। সর্বনিম্ন বুদ্ধির অধিকারী মানুষকেও তার সাধ্য এবং সামর্থ্য অনুসারে কাজ করতে বলেছেন। প্রত্যেক

মানুষ ঈমান অর্জন করবে এটিই আল্লাহ্ চান। তাই সর্বনিম্ন বিবেক-বুদ্ধির জন্যও একটি মানদন্ড নির্ধারণ করেছেন আর তা হলো, যার যতটুকু সামর্থ্য আছে সেই অনুসারে অবশ্যই তার ঈমান অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। যদি সর্বনিম্ন বা সবচেয়ে দুর্বল বুদ্ধির জন্য ঈমানের কোন মানদন্ড নির্ধারণ না করতেন তাহলে সব মানুষের ওপর ঈমান আনার দায়িত্ব ন্যস্ত হতো না অর্থাৎ ঈমান আনা তাদের জন্য আবশ্যক হতো না। কেবল তারাই দায়ী হতো, যারা বিবেক-বুদ্ধি ও মেধার দৃষ্টিকোন থেকে উন্নতমানের, যাদের সামর্থ্য এবং যোগ্যতা অনেক উন্নত মানের। যদি কোন ব্যক্তি কোন কথা না বুঝে তাহলে সে নির্দেশ পালন না করার দোষে দোষী হবে না। তাই আল্লাহ্ তা'লা সর্বনিম্ন বিবেক-বুদ্ধি থেকে আরম্ভ করে সর্বোচ্চ বিবেক-বুদ্ধি পর্যন্ত পদমর্যাদা অনুসারে মান নির্ধারণ করেছেন। কারো বুদ্ধি বেশি, কারো বুদ্ধি কম। কারো ভেতর সামর্থ্য এবং যোগ্যতা বেশি আবার কারো মাঝে কম। জাগতিক বিষয়েও আমরা দেখি, এই মানসিক অবস্থা এবং প্রবণতা অনুসারে কেউ উন্নত কাজের দক্ষতা এবং যোগ্যতা রাখে আর এ সুবাদে বহুদূর এগিয়ে যায় আবার কেউ মধ্যম পর্যায়ের হয়ে থাকে। আর কেউ অনেক পিছিয়ে থাকে। আবার পেশার দৃষ্টিকোন থেকেও আমরা দেখি, কেউ কোন পেশায় এগিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা এবং দক্ষতা রাখে আবার কেউ অন্য কোন পেশায়। আবার শিক্ষার ক্ষেত্রেও কারো আকর্ষণ এক বিষয়ের দিকে হয়ে থাকে, কারো ভিন্ন বিষয়ের প্রতি। তাই এটি একটি সহজাত বিষয়, আকর্ষণ বা প্রবণতাই মানুষকে বিভিন্ন কাজ করার এবং সেই কাজে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।

যাহোক সব মানুষ সমান হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে এভাবে সৃষ্টি করেন নি। আর পরিস্থিতি তাকে সমান থাকতেও দেয় না। মানুষের সামর্থ্য এবং যোগ্যতার মাঝে পার্থক্য থেকে থাকে। সমান সুযোগ দেয়া হলেও কেউ এগিয়ে যায় আর কেউ পিছিয়ে পড়ে। বিবেক-বুদ্ধি ছাড়া অন্যান্য কিছু বিষয়ও এটিকে প্রভাবিত করে। আধ্যাত্মিক জগত বা ঈমানের জগতের অবস্থাও একই। যেভাবে বাহ্যিক জগতে ঘটে থাকে একইভাবে আধ্যাত্মিক বা ঈমানের জগতেও একই অবস্থা ঘটে। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রেও বিষয় এমনই। নিজেদের শক্তি এবং সামর্থ্য অনুসারে কেউ এগিয়ে যায়, কেউ পিছিয়ে পড়ে। সবার কাছে আমরা এই আশা রাখতে পারি যে, সবাই ঈমান আনবে, কিন্তু এটি হতে পারে না বা এটি আশাও করা যায় না যে, সবার ঈমান এবং কর্মের মান সমান হবে। আল্লাহ্ তা'লা এই কথা অবশ্যই বলেন, মানুষ কেন ঈমান আনে না; পবিত্র কুরআনেও এর উল্লেখ রয়েছে যে, তোমরা কেন নিজেদের পরিণামকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিচ্ছ। কিন্তু কুরআনের কোথাও এই দাবী নেই বা এ দাবী করা হয়নি যে, সবাই হযরত আবু বকর (রা.) বা হযরত ওমর (রা.)-এর মত মু'মিন কেন হয় না?

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, ইসলাম কাকে বলে? তিনি (সা.) বলেন, দিবা-রাত্র পাঁচ বেলা নামায পড়া ফরয বা আবশ্যক। সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, এছাড়া অন্য কোন নামায পড়া আবশ্যক কি-না? মহানবী (সা.) বলেন, না। যদি নফল বা অতিরিক্ত নামায পড়তে চাও তাহলে পড়তে পারো। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, এক মাস রোযা রাখা ফরয বা আবশ্যক। সেই ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করে, এছাড়া অন্য কোন রোযা

ফরয বা আবশ্যক কি-না? মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন, না। অবশ্য যদি নফল রোযা রাখতে চাও তাহলে রাখতে পারো। একইভাবে রসূলে করীম (সা.) যাকাতের কথাও উল্লেখ করেন। সেই ব্যক্তি তখন প্রশ্ন করে, এছাড়া অন্য কোন যাকাত বা সদকা করা আমার জন্য আবশ্যক কি-না? তিনি (সা.) বলেন, না। তবে পুণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে যদি অতিরিক্ত সদকা করতে চাও করতে পারো। এ কথাগুলো শুনে সেই ব্যক্তি ফিরে যান। কিন্তু যাওয়ার পথে বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এর চেয়ে বেশিও করবো না আর কমও করবো না। তিনি (সা.) তার মন্তব্য শুনে বলেন, সে যদি সত্য বলে থাকে তাহলে তাকে তোমরা সফল মনে করতে পারো। তিনি (সা.) তাকে সফলকাম আখ্যায়িত করেছেন। আর এটি বলে তিনি তাকে জান্নাতের শুভ সংবাদ দেন।

অতএব এটি থেকে বুঝা যায়, ইসলাম সবার কাছে হযরত আবু বকর (রা.) বা হযরত ওমর (রা.)-এর মত ঈমানের অধিকারী হওয়ার দাবী করে না। সবার পদমর্যাদা পৃথক পৃথক। সবার শক্তি ভিন্ন আর সবার ঈমানের মানও ভিন্ন। হযরত আবু বকর (রা.) যাকাত দেয়ার পরও নিজের পুরো সম্পদ নিয়ে আসেন ইসলামের খাতিরে। হযরত ওমর (রা.) ভেবেছিলেন, আজ আমি আবু বকরের চেয়ে এগিয়ে থাকবো আর নিজের ঘরের অর্ধেক সম্পদ নিয়ে আসেন। কিন্তু দেখলেন, হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর পুরো সহায়-সম্পদ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে নিয়ে এসেছেন। কাজেই, এখানেও সবার মান পৃথক-পৃথক। এটি অবশ্যই সত্য কথা যে, সবার কাছে এত উন্নত মানে উপনীত হওয়ার প্রত্যাশা করা যায় না, কিন্তু সবাইকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, নফল ইবাদতেরও একটা সওয়াব রয়েছে। বরং এটিও বলেছেন, নফল ফরযের ঘাটতিকেও পূরণ করে। ঈমান এবং বিশ্বাসের মানকে উন্নত করে। ঈমান এবং বিশ্বাসে সমৃদ্ধ করে। কিন্তু কোথাও এ নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, মানুষের অবস্থা যাই হোক না কেন সবাইকে নফল পড়তেই হবে। অর্থাৎ শুধু নামায নয় বরং সব আবশ্যকীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে একথা বলা যায় যেমন, আর্থিক কুরবানী বা সময়ের কুরবানীর ক্ষেত্রেও একই বিষয়কে সম্প্রসারিত করা যায়। কেননা উন্নতমানের আমল বা পুণ্যকর্ম যোগ্যতার সাথে সম্পর্ক রাখে, এটি সবার জন্য আবশ্যক নয়। আর মানুষের যোগ্যতা এবং সামর্থ্য যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে তাই ন্যূনতম যোগ্যতা বা বিবেক যা সবার মাঝে থেকে থাকে, সেই অনুসারে কর্মের দাবী করা হয়েছে। ঈমানের উন্নত মান বা মাপকাঠি অনুসারে সবার কাছ থেকে আমলের দাবী করা হয়নি। উন্নত থেকে উন্নততর ঈমানদার ব্যক্তির উন্নত মাপকাঠি অনুসারেও নয় আবার ন্যূনতম ঈমানের অধিকারী ব্যক্তির ঈমানের যে উন্নততর মান আছে তাকে সে পর্যন্ত পৌঁছতেও বলা হয়নি। অতএব এই পার্থক্য করা হয়েছে সামর্থ্য ও যোগ্যতার নিরিখে। আর কোন ব্যক্তিকে কষ্টের মুখে ঠেলে দেয়া হয়নি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে তাদের জ্ঞানের পরিধির ঊর্ধ্বে কোন কথা গ্রহণে বাধ্য করেন না। আর সেই বিশ্বাসই তাদের সামনে উপস্থাপন করেন যা বোঝা মানুষের সাধ্যের অন্তর্গত যেন তাঁর নির্দেশ পালন সাধ্যাতীত না হয়।

অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম এবং তার বোধ-বুদ্ধির যে সামর্থ্য আছে এর পরম সীমাই হলো তার পুণ্যের মাপকাঠি; কেননা আল্লাহ্ তা'লা কারো ওপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপান না। এখানে একথাও স্পষ্ট হওয়া উচিত, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের হৃদয়ের

গভীরতম প্রদেশ সম্পর্কেও অবহিত। জ্ঞানের স্বল্পতা বা বুদ্ধির ঘাটতি বা সামর্থ্যের ঘাটতির কোন অজুহাত আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হবে না। তাই একথা সামনে রেখে নিজেদের সামর্থ্য এবং যোগ্যতাকে খতিয়ে দেখে ঈমান এবং কর্ম বা আমলকে যাচাই করতে হবে। এটি ভাবলে চলবে না যে, মান যেহেতু ন্যূনতম তাই কিছুটা আমল করলেই হবে। ন্যূনতম যেই মানদন্ড মহানবী (সা.) নির্ধারণ করেছেন তাহলো, পাঁচ বেলা নামায পড়া। আর পুরুষের জন্য পাঁচ বেলার নামায বাজামাত পড়া আবশ্যক। রোযা রাখা আবশ্যক। আর্থিক সামর্থ্য থাকলে যাকাত প্রদান করাও আবশ্যক। অতএব এহলো ন্যূনতম মানদন্ড বা মান। সুতরাং এসব মাপকাঠি সামনে রেখে সবাইকে আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত। যেমনটি আমি বলেছি, এই হাদীস অনুসারে সেই ব্যক্তি বলেছে, আমি এর বেশিও করবো না আর কমও করবো না। সে যে ঘোষণা দিয়েছিল তা ছিলো ন্যূনতম মান। আমাদের অনেকেই এমন আছে যারা নামাযও হুবহু খোদার নির্দেশ অনুসারে পড়ে না। ফরয নামায বা আবশ্যকীয় নামায সম্পর্কে আমি বলেছি, পুরুষদের জন্য বাজামাত নামায পড়া ফরয বা আবশ্যক। তাই সবসময় স্মরণ রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'লাকে কোনভাবে প্রতারিত করা যায় না। যেভাবে বিভিন্ন জাগতিক কাজ-কর্মের জন্য চেষ্টা-সাধনা করা হয়, ধর্মীয় কাজের জন্য এর চেয়ে বেশি, এর চেয়েও অধিক চেষ্টা এবং সংগ্রাম করতে হবে। আর সামর্থ্য বাড়ানোর চেষ্টাও করা চাই। এ পৃথিবীতে আমরা দেখি, দুর্বলরা সবসময় নিজেদের জন্য সাপোর্ট বা অবলম্বন সন্ধান করে। কিন্তু সামর্থ্য এবং যোগ্যতা যেহেতু ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে থাকে তাই যাদের মাঝে কিছু যোগ্যতা থাকে, তারা এগিয়ে যায় কিন্তু কিছু মানুষের বেশি সাহায্য বা সাপোর্টের প্রয়োজন হয়। তারা কাজ ছেড়ে দিয়ে এই অজুহাতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বসে যাবে যে, আমাদের যোগ্যতাই এতটা ছিল বা সামর্থ্যই এতটুকু ছিল; এটি গৃহীত হতে পারে না। জাগতিক আইনে বা নিয়ম অনুসারে হয়তো কারো ওপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপানো যেতে পারে, এটি সম্ভব। কিন্তু যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ধর্মীয় বিষয়ে এমনটি হয়না। ন্যূনতম যোগ্যতা অনুসারে যেখানে দায়িত্ব অর্পণ করা হয় সেখানে সাধ্যের বা সামর্থ্যের অধিক বোঝা কারো ওপর চাপানোর প্রশ্নই উঠেনা। হ্যাঁ কোন কোন বিষয় অনুধাবনের জন্য কিছু সাহায্য বা সাপোর্ট বা অবলম্বনের প্রয়োজন হয় যেভাবে জাগতিক বিষয়েও এরূপ সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে। এসব সাপোর্ট বা নির্ভরস্থলের পথপানে দুর্বল মু'মিনদের চেয়ে থাকা উচিত যেভাবে একজন দুর্বল ছাত্র শিক্ষকের কাছ থেকে বারবার কোন পাঠ বোঝার চেষ্টা করে আর শিক্ষকের প্রচেষ্টায় তাদের মান উন্নত হয়। কিন্তু শিক্ষক যদি সাহায্য না করে তাহলে সে পিছিয়ে থাকে। কিন্তু এমন শিক্ষক যারা সাহায্য করে না তাদের আচরণের মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সেই সকল শিক্ষক সত্যিকার অর্থে নিজের আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করছে না। বরং নিজ দায়িত্বের প্রতি অবিচার করছে। এখানে আমি ধর্মীয় কাজের উদ্দেশ্যে যে সকল শিক্ষক নিযুক্ত রয়েছে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই অর্থাৎ আমাদের মুরুব্বী এবং মুবাল্লেগীন এবং জ্ঞানী লোকদের কথা বলছি। আল্লাহ্ তা'লা যে তাদের সামর্থ্য এবং যোগ্যতা বৃদ্ধি করেছেন তাদের উচিত এর সঠিক ব্যবহার করা। স্বীয় যোগ্যতা ও সামর্থ্যের আলোকে জ্ঞানগত ক্ষেত্রে দুর্বলদের সামর্থ্য এবং যোগ্যতা বাড়ানোর চেষ্টা করুন। কেননা এটি আপনাদের পক্ষ থেকে খোদা-প্রদত্ত শক্তি এবং সামর্থ্যের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ হবে। যদি

সত্যিকার অর্থে খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা না হয় তাহলে মানুষ গোনাহ্‌গার চিহ্নিত হয়।

তাই মুরুব্বী, মুবাল্লেগ এবং অন্যান্য ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী, যাদের ধর্মীয় জ্ঞান রয়েছে তাদের এ কথার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া চাই। দুর্বলদেরকে সাহায্য করে সামর্থ্য এবং যোগ্যতার ক্ষেত্রে তাদের উন্নীত করুন। ন্যূনতম যে স্তর আছে এর চেয়ে উন্নত স্তরে আসার জন্য যোগ্যতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য করুন বা তারা যে বিভিন্ন স্তরে রয়েছে সেক্ষেত্রে তাদের মানোন্নয়নের চেষ্টা করুন। একাজ যেখানে উন্নয়নশীল ব্যক্তির ঈমান এবং বিশ্বাস বৃদ্ধির কারণ হবে সেখানে জামাতী উন্নতির ক্ষেত্রেও তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মুবাল্লেগ এবং মুরুব্বীদেরকে তো আল্লাহ্‌ স্বয়ং বলেছেন, তোমাদের জ্ঞানের কারণে তোমাদের সামর্থ্য ও যোগ্যতা বৃদ্ধি করা হয়েছে তা নিজের ভাইদের সামর্থ্য এবং যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্যও কাজে লাগাও। যেভাবে আল্লাহ্‌ তা’লা বলেন, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ (সূরা আলে ইমরান: ১০৫)। তোমাদের মাঝে এমন একটি জামাত থাকা চাই, যাদের কাজ হবে মানুষকে পুণ্যের পথপানে পরিচালিত করা বা আহ্বান করা। আজকাল আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় সারা পৃথিবীতে আহমদীয়া জামাতের বেশ কয়েকটি জামেয়া আহমদীয়া কাজ করছে সেখান থেকে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের পর মুবাল্লেগ এবং মুরুব্বীরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছেন। তাদের কাজ হলো, জামাতের তরবীয়তের প্রতি যথাযথ এবং পূর্ণ মনোযোগ দেয়া। ধর্মীয় জ্ঞান তারা বিশেষ উপলক্ষ বা বক্তৃতা বা মুনাযেরা বা গুটিকতক ব্যক্তিকে তবলীগ করার জন্য অর্জন করেন নি। বরং অব্যাহতভাবে নিজেদের একাজে নিয়োজিত রাখা তাদের আবশ্যকীয় দায়িত্বের অন্তর্গত। স্বজনদেরও তরবীয়ত করতে হবে, তাদের ঈমান এবং বিশ্বাসে সমৃদ্ধ হওয়ার রীতিও শিখাতে হবে, তাদের সামর্থ্য এবং যোগ্যতা বৃদ্ধিরও চেষ্টা করতে হবে, আর জগদ্বাসীকে কল্যাণের পথে আহ্বান করার নিত্য-নতুন পথও আবিষ্কার করতে হবে। অনেকে এমন আছে যারা খুব বেশি অভিজ্ঞ সাজে। তারা বলে, কোন কাজ নেই। যে কাজ দেয়া হয় সে কাজ আমরা তাৎক্ষণিকভাবে করে ফেলি। কিন্তু তাদের এমন ধারণা ভুল। এটি আসলে বাহানা বা অজুহাতই হয়ে থাকে। অনেকেই নিজের কাজের প্রতি মনোযোগ দেয়ার পরিবর্তে নিজেদের পারিবারিক দায়িত্বের প্রতি বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করে। অনেকেই অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এমন মানুষ গুটি কতক হলেও জামাত যেহেতু ছোট তাই তারা স্পষ্টভাবে সামনে এসে যায়। সপ্তাহে তিন দিন বিভিন্ন স্টোরে ঘোরাফেরা করে। আমি শুধু নবাগতদের কথা বলছি না। তাদের মাঝে অনেকেই আল্লাহ্‌ তা’লার ফযলে এমনও রয়েছেন যারা ত্যাগের মন- মানসিকতায় সমৃদ্ধ। এখন পর্যন্ত তারা একটি বিশেষ প্রেরণা নিয়ে কাজ করছেন। আল্লাহ্‌ করুন তাদের এই চেতনা যেন অম্লান থাকে। তাদের অধিকাংশই সময়ের ব্যাপারে সচেতন। যারা অভিজ্ঞ, প্রবীণ মুরুব্বী যারা রয়েছেন তাদের এদিকে বেশি মনোযোগ দিতে হবে। আল্লাহ্‌ তা’লা যে তাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করেছেন, তাদের ওপর যে আবশ্যকীয় দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে, তাদের উচিত হবে স্ব স্ব গন্ডিতে এর সঠিক ব্যবহার করা। আর জামাতের সভ্য এবং সদস্যদের যোগ্যতা এবং সামর্থ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একজন উত্তম শিক্ষকের ন্যায় তা কাজে লাগানো। আল্লাহ্‌ তা’লা জানতেন যে, একটি সিস্টেম বা ব্যবস্থাপনা চালানোর জন্য তা পৃথিবীর যে কোন ব্যবস্থাপনাই হোক

না কেন, বিভিন্ন ধরনের মানুষের প্রয়োজন হয়। তাই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমাদের মাঝে কিছু মানুষ এমন হওয়া চাই যারা নিজেদের ঈমান এবং ধর্মীয় জ্ঞানের সামর্থ্য ও যোগ্যতা বৃদ্ধি করে পৃথিবীবাসীর কল্যাণের জন্য তা কাজে লাগাবে। আর ওয়াক্‌ফে যিন্দেগীরা স্বেচ্ছায় আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেরদের এই কাজের জন্য উপস্থাপন করেছেন। তাই তাদের জ্ঞান এবং নিজেদের এইভাবে পেশ করার দাবী হলো, এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। এটি সত্য কথা যে, এই জ্ঞান অর্জন এবং জ্ঞান শিখানোর ক্ষেত্রে সবাই সমান হতে পারে না। সবার সামর্থ্য এবং যোগ্যতা পৃথক পৃথক। সবাই সমানভাবে মানুষের উপকার করতে পারে না। সমানভাবে অন্যের সামর্থ্য এবং যোগ্যতা প্রস্ফুটিত করতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের ব্যক্তিগত দক্ষতা এবং ধর্মীয় জ্ঞান শিখানোর দক্ষতা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু যতটা যোগ্যতা এবং সামর্থ্য রয়েছে তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে উন্নত মানে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। সবাই যদি এভাবে নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করে তাহলে যেখানে তারা দুর্বল ভাইদের জন্য কল্যাণকর হবে সেখানে তারা জামাতেরও মান উন্নয়নকারী হবে।

তাই ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী বিশেষ করে, মুরুব্বীদের ওপর অনেক বড় দায়িত্ব ন্যস্ত হয় আর জামাতের সদস্যদের যোগ্যতা এবং সামর্থ্যের মান উন্নত করার ক্ষেত্রে তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। একইভাবে ওহ্‌দাদার রয়েছেন। জামাতের সদস্যরা তাদেরকে এ মানসে ওহদাদার বা পদাধীকারী নিযুক্ত করেন যে, তাদের বিশ্বাস হলো, এরা এমন মানুষ যাদেরকে আমরা কোন পদ দিতে চাই, তাদের সামর্থ্য, যোগ্যতা, জ্ঞান এবং বিবেক-বুদ্ধি আমাদের চেয়ে বেশি এবং উন্নত। আমি মনে করি, নির্বাচনকারীদের মাঝে এই চিন্তা-চেতনা থাকা উচিত। এটি ছাড়া ভোটের যে আমানত তাদের ওপর ন্যস্ত রয়েছে সেই দায়িত্ব তারা পালন করতে পারবে না; কেননা এই চিন্তা-চেতনা রাখা হলো, ন্যূনতম মান। এই আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালনের ন্যূনতম মান যদি ওহ্‌দাদার বা পদাধিকারী নির্বাচনের সময় সামনে থাকে তাহলে কখনও এমন কোন কর্মকর্তা নির্বাচিত হতে পারে না– যাকে শুধু পদের খাতিরে নির্বাচন করা হয়।

যাহোক, ওহ্‌দাদার বা পদাধিকারীদের দায়িত্ব হল, জামাতের জ্ঞানগত এবং ধর্মীয় উন্নয়নের মানকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা, তাদের সামর্থ্য এবং যোগ্যতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা যেন নিজ নিজ গন্ডিতে প্রত্যেক ব্যক্তির যোগ্যতা এবং সামর্থ্য বৃদ্ধি পেতে পারে। তরবীয়তের প্রশ্নের ক্ষেত্রে সেক্রেটারী তরবীয়ত এবং জামাতের প্রেসিডেন্ট এর পাশাপাশি আমেলার অন্যান্য সদস্যদেরও দায়িত্ব হল, নিজ নিজ আদর্শের মাধ্যমে অন্যদের তরবীয়তের প্রতি মনোযোগ দেয়া। দৃষ্টান্তস্বরূপ খুতবা শোনা, দরস শোনা, জামাতী অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করা, যেন ধর্মীয়, জ্ঞানগত এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। এসব অনুষ্ঠানে মানুষকে নিয়ে আসা এবং এসব খুতবা ও জলসা ইত্যাদি থেকে লাভবান হয়ে স্থায়ীভাবে জামাতের সদস্যদের স্মরণ করানো ওহ্‌দাদারদের কাজ। মুরুব্বীদের পাশাপাশি এটি ওহ্‌দাদার বা পদাধিকারীদেরও দায়িত্ব। আমেলার প্রত্যেক সদস্যের এটি আবশ্যকীয় দায়িত্ব।

কোন কোন মুরুব্বী খুব সুন্দরভাবে এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তারা আমার খুতবার নোটস্ নিয়ে থাকেন। এরপর পুরো সপ্তাহ নিজেদের দরসে, বিভিন্ন বৈঠকে বা মজলিসে খুতবার কোন না কোন বিষয় উদ্ধৃত করে নসীহত করে থাকেন, যা ব্যক্তির

ওপর এবং সমষ্টিগতভাবে জামাতের সদস্যদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে থাকে। অনেকে আমার সামনে একথা প্রকাশও করে থাকেন, দরস শুনে আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। অমুক কাজ সঠিকভাবে করার রীতি শিখেছি। আমাদের আলস্য দূরীভূত হয়েছে। কিন্তু ওহ্দাদার এবং অন্যান্য দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা যদি এ কথাকে যথেষ্ট মনে করে নেয় যে, আমরা আমাদের দরসে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটা উদ্ধৃতি শুনিয়ে দিয়েছি বা মানুষ খলীফায়ে ওয়াক্তের খুতবা শুনে তাই বার বার ব্যক্তিগতভাবে বা বিভিন্ন মজলিসে ও বৈঠকে এ কথাগুলো পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই বা স্মরণ করানোর প্রয়োজন নেই তাহলে এমন ধারণা বা মনোবৃত্তি ভুল। এই ধারণায় বশবর্তী হয়ে যদি নসীহত থেকে বিরত থাকা হয় যে, খলীফায়ে ওয়াক্তের নসীহতের যেখানে প্রভাব পড়েনি সেখানে আমাদের নসীহতে আর কী কাজ হবে? এমন মনোবৃত্তিও ভুল। অবস্থা যাই হোক না কেন স্মরণ করানো আবশ্যক। প্রথম কথা হল, অনেকে অনেক কথা বুঝেই না। আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির বিভিন্ন শব্দ নিজ ভাষায় সাবলীলভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করি কিন্তু তারপরেও আমি দেখেছি, অনেকেই বলে আমরা বুঝি নি বা তারা যা বুঝেছে সেটি সঠিক ছিল না। তাই বিভিন্ন সময় সহজ ভাষায় মজলিসে বা বৈঠকে যদি তা বোঝানো হয় তাহলে স্বল্পযোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তিরাও বুঝতে পারে।

তাই পৃষ্ঠপোষকতার অবশ্যই প্রয়োজন হয় আর যাদের ওপর দায়িত্ব রয়েছে তাদের উচিত অন্যদের সাহায্য করা। অনেকে নিজেরা বোঝার চেষ্টা করে। অনেকেই আমাকে লিখেন, খুতবা দু'তিনবার শোনার পর আমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সবাই নিজ থেকে মনোযোগ দেয় না। সুতরাং এমন মানুষ যারা ধর্মের কাজের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে আর এমন মানুষ যাদের ওপর দুর্বলদের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব রয়েছে, তাদেরকে অবশ্যই এ উদ্দেশ্যে চেষ্টা করা উচিত। এখনই বাজামাত নামাযের কথা হয়েছে, জামাতের সাথে নামায পড়ার কথা হয়েছে যা পুরুষদের জন্য আবশ্যক। আমি প্রায়শঃই এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকি। এক্ষেত্রেও যারা রীতিমত মসজিদে আসে তারা যদি অন্যদের সাহায্য করে তাহলে উন্নতি হতে পারে। ওহ্দাদার হওয়া আবশ্যক নয়, সাধারণ মানুষও এক্ষেত্রে অন্যের সাহায্যকারী হতে পারে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একবার বলেছেন, একদিন ইশার নামাযের জন্য আমি মসজিদে আসি। দেখলাম নামাযীদের শুধু দুটো সারি রয়েছে। কাদিয়ানের কথা হচ্ছে। আমি বললাম, নামাযীদের উচিত হবে, নামাযে আসার সময় প্রতিবেশীদের সাথে করে নিয়ে আসা। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি দেখেছি পরের দিন সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করেছে। পরে যারা নামাযে যোগ দিয়েছে তারাও জানতো যে, নামায ফরয্ বা আবশ্যক, এটি সবাই জানে। কিন্তু তাদের মাঝে এই গুরুত্বকে স্মরণ রাখার যোগ্যতার ঘাটতি ছিল বা আলস্য তাদের যোগ্যতা ও সামর্থ্যের ঘাটতির কারণ হয়েছে। তাই স্মরণ করানো মানুষের সামর্থ্যে ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করে বা তার উন্নয়নের কারণ হয়ে থাকে। নামাযে উপস্থিতি বৃদ্ধি পাওয়া বলছে যে, সাধ্যাতীত দায়িত্ব ন্যস্ত করা মসজিদে আসার পথে বাঁধা ছিল না বরং আলস্য, যোগ্যতা এবং সামর্থ্যকে এ বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করতে দেয়নি। যার ফলে ধীরে ধীরে তার সামর্থ্য এবং যোগ্যতায় মরিচিকা পড়তে থাকে আর মসজিদে আসার ক্ষেত্রে

আলস্য দেখা দেয়। তাই সামান্য চেষ্টা করলেই অলসরা নিজেদের ঔদাসিন্য দূর করতে পারে। এ কারণেই সম্প্রতি আমি বিশেষভাবে কিছু তরবিয়তী বিষয়ের প্রতি ইমাম সাহেব অর্থাৎ আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করি, তখন একথাও বলেছিলাম, জামাতের সদস্যদের বলুন, পরস্পরকে মসজিদে আসার ব্যাপারে সাহায্য করতে। এখানে যদি দূরত্ব বেশি হয়ে থাকে তাহলে প্রতিবেশীরা নিজেদের বাহন পালাক্রমে ব্যবহার করতে পারেন যেন কারও ওপর তেল খরচের বোঝা সাধ্যাতীত না হয়। অনেকে এমন আছেন যারা পূর্বেই এমন কাজ করছেন বা করেন। জিলিংহামের এক বন্ধু আমাকে বলেছেন, ফজরের সময় তার বন্ধু দশ মিনিট পূর্বেই ফোন করে দেন যে আমি এত মিনিট পরে পৌঁছবো, ফজরের নামাযের জন্য প্রস্তুত থাকুন। যদি এভাবে পরস্পরকে স্মরণ করানো হয় তাহলে মসজিদে উপস্থিতি অনেক বাড়তে পারে। তাই সবসময় স্মরণ রাখবেন, সবকথা থেকে সবাই সমানভাবে উপকৃত হয় না, স্মরণ করানোর প্রয়োজন থেকেই যায়। আমি যেমনটি আগেও বলেছি, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুসারে কথা হৃদয়ঙ্গমের চেষ্টা করে। অনেকে নিজের থেকেই চেষ্টা করে আবার কিছু লোক অবলম্বন সন্ধানের মাধ্যমে উন্নতির চেষ্টা করে। কিছু মানুষের নিজ থেকেই সাহায্যকারী বা পৃষ্ঠপোষক হতে হয় যেন ব্যক্তির যোগ্যতা ও সামর্থ্যেরও উন্নতি হয় আর এর পাশাপাশি জামাতী উন্নতিরও কাঙ্ক্ষিত মান অর্জিত হয়। তাই জামাতের ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত মানের সাধারণ সদস্যদেরও স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করা উচিত।

এরপর মনোযোগের কথা বলা হচ্ছে, খুতবায় মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা উচিত। খুতবা চলাকালে আমিও কোন কোন সময় দেখেছি অনেকে নিজেই হয়তো অনুভব করে থাকবেন যে, অনেকের তন্দ্রা এসে যায়; শুধু তন্দ্রাচ্ছন্নই হয়না বরং এত গভীরভাবে ঘুমায় যে ঝাঁকুনি খেয়ে পাশে বসা ব্যক্তির গায়ে গিয়ে পড়ে। এমন লোকদের জাগাতে হয়; এমন মানুষও থেকে থাকে। কিছু এমন মানুষও আছে যাদের শ্রবণ শক্তি দুর্বল। তারা সঠিকভাবে কানে শোনে না বা কি বলা হচ্ছে তা বুঝে উঠতে পারে না। অনেকেই আবার নিজের চিন্তার জগতে হারিয়ে যায়। এই যে হরেক প্রকার মানুষ রয়েছে তাদের সম্পর্কে মনে করা যে, তারা খুতবা শুনেছেন বা বক্তৃতা শুনেছেন, এভাবে শোনার কি-ইবা প্রভাব পড়তে পারে তাদের ওপর। যাহোক, তাদেরকে স্মরণ করাতে হবে এবং মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক। আর আমি যেভাবে বলেছি, খুতবার পরে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। জলসা চলাকালে হয়তো আশেপাশে যারা বসে আছেন তাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন দেখে বা নিজের ঘুম দূর করার জন্য কিছু মানুষ ধ্বনি উত্তোলন করে থাকে। কিন্তু বক্তৃতা শোনা, খুতবা শোনা, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, সেটিকে হৃদয়ঙ্গম করা এবং কর্মে রূপায়িত করা, এই কথাগুলোর প্রত্যেকটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত সামর্থ্য এবং যোগ্যতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। যদি স্মরণ করানো হয় তাহলে সামর্থ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এছাড়া ইসলাম সকল মু'মিনের জন্য এটিও আবশ্যক আখ্যা দেয় যে, অন্যদের নিজের সাথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, এটি শুধু মুরুব্বী, মুয়াল্লিম বা ওহ্দাদারদেরই কাজ নয়। নামাযের জন্য অন্যদের নিয়ে আসার প্রতি মনোযোগ দেয়া, আমাদের মসজিদের আশপাশে যে সমস্ত প্রতিবেশী

থাকেন, মসজিদ ফযল বা বায়তুল ফুতুহ-র আশেপাশে যারা থাকেন তারা যদি প্রতিবেশীদের স্মরণ করান তাহলে উপস্থিতি বাড়তে পারে, দূর থেকে নিয়ে আসা আবশ্যক নয়। একই কথা অন্যান্য মসজিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আর এটিই প্রকৃত ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ভালবাসাও বটে। তাদের প্রতি খেয়াল রাখা, তাদের আবশ্যকীয় দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা এটি প্রকৃত ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ভালবাসাও বটে। মু'মিনরা যখন নিজেরা এগিয়ে যাবে তখন তাদের উচিত হবে ভাইদেরও আহ্বান জানানো যে, আসো আর এটি অর্জন কর। আর এটি আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের জন্য আবশ্যক করেছেন। যারা দুর্বল তাদের টেনে উপরে উঠাও। অন্যদেরকে টেনে উপরে উঠানো, একাজ নিজ গুণে মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতের উত্তরাধিকারী করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, পুণ্যের পথের দিশারী সেভাবেই পুণ্যের ভাগী হয় যেভাবে পুণ্যকর্মশীল ব্যক্তি হয়ে থাকে। তাই যে ব্যক্তি বাজামাত নামায পড়ে, এতে সে নিজে বাজামাত নামাযের সাতাশ গুণ পুণ্য অর্জন করবে, সে নিজের সাথে যতজনকে নিয়ে আসবে তাদের পুণ্যও সে লাভ করবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক ব্যক্তি যদি তিনজনকে সাথে নিয়ে নামাযে আসে তাহলে সেই নামাযে সে সাতাশ এর পরিবর্তে একশত আট গুণ সওয়াব পাবে। অতএব দেখুন! আল্লাহ্ তা'লার স্বীয় বান্দাদেরকে আশিসমন্ডিত করার পদ্ধতি কত অভিনব। তাই আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজে ধর্মীয় কাজে সক্রিয় তার অন্যদেরকেও সক্রিয় করার চেষ্টা করা উচিত। সবাই যদি এই চেতনা নিয়ে কাজ করে তাহলে আমরা কেবল অন্যদের সামর্থ্য এবং যোগ্যতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেই অবদান রাখব না বরং আমাদের নিজেদের যোগ্যতা এবং সামর্থ্যও এই চেতনার সাথে বৃদ্ধি করব যে, আমি এক জায়গায় স্থবির থাকব না, আমাকে উন্নতি করতে হবে। আর এভাবে অন্যদের কল্যাণের বিধান করে খোদার বহুগুণ বর্ধিত কৃপারাজি লাভ করবে যেমনটি কিনা আমি হাদীসের বরাতে পূর্বেই বলেছি। এটি জামাতের সার্বিক উন্নতির ক্ষেত্রে এক অসাধারণ পরিবর্তনের কারণ হবে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে তৌফিক দিন, আমরা যেন আমাদের সামর্থ্য এবং যোগ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে সক্ষম হই আর ক্রমাগতভাবে খোদার ফযল এবং কৃপাবারি আকর্ষণ করতে পারি।

আজও আমি নামাযের পর দু'জনের গায়েবানা জানাযা পড়াব। একটি জানাযা হলো শ্রদ্ধেয়া জানানাল আনী সাহেবার। তিনি সিরিয়া নিবাসী কিন্তু সম্প্রতি তুরস্কে বসবাস করছিলেন। ২০১৫ সনের ২৩শে জানুয়ারি ৫৭ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ১৯৫৮ সনের ১১ই জানুয়ারি তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে তিনি ভাবতেন, ইহজগত ক্ষণস্থায়ী। তাই খোদার নৈকট্য সন্ধান করা উচিত। এই মানসে অনেক ফিরকা সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছেন, কোথাও শান্তি খুঁজে পাননি। সবসময় গভীর বেদনার সাথে আল্লাহ্‌র দরবারে হিদায়াতের জন্য দোয়া করতে থাকেন। অবশেষে ১৯৯৪ সনে এমটিএ'র সাথে পরিচিত হন। লিক্বা মাআল আরাব অনুষ্ঠান তার হৃদয়ে ঘর করে। এই অনুষ্ঠানগুলো দেখার পর প্রথম বার তিনি মানসিক প্রশান্তি লাভ করেন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন পাঠান। 'লিক্বা মা'আল আরব' অনুষ্ঠানে এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। 'লিক্বা মা'আল আরব' অনুষ্ঠানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র উত্তর শুনে

তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন। আর ১৯৯৫ সনেই স্বামীর সামনে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। এই সিদ্ধান্তে তার মেয়েও তার সাথে ছিল। যদিও পিতার পক্ষ থেকে তিনি ভয়াবহ বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু তার নেকী, তাক্বওয়া, উত্তম চরিত্র এবং পুণ্যকর্ম দেখে তার স্বামী এবং অন্যান্য সন্তান-সন্ততিও আহমদীয়াতের ক্রোড়ে আশ্রয় নেয়।

মরহুমা অত্যন্ত সরলপ্রাণ, সর্বজনপ্রিয় চরিত্রের অধিকারিণী, নিষ্ঠাবতী, তাহাজ্জুদগুযার, কোমল হৃদয়ের অধিকারিণী ছিলেন। সবাইকে সাহায্য করতেন। ছোট-বড় সবার প্রতি স্নেহ এবং ভালবাসার আচরণ করতেন। মরহুমা সিরিয়া এবং তুরস্কে লাজনা ইমাইল্লাহ্ এবং বাচ্চাদের তরবীয়ত করেন। জামাতের ব্যবস্থাপনা এবং খিলাফতের প্রতি ভালবাসা, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততার গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয় তাদের হৃদয়ে গ্রথিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। একটি শহরে দীর্ঘদিন তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এরপর যখন তুরস্ক আসেন সেখানেও তাকে স্কেন্দ্রুনের লাজনার প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয়। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করতে থাকেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্য হিসেবে স্বামী ছাড়াও দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। সকলেই বড় নিবেদিতপ্রাণ আহমদী। তিনি মূসীয়া ছিলেন। কিন্তু সিরিয়ার অবস্থার কারণে রেকর্ড হরিয়ে যায়। যাহোক, তার ওসীয়্যতের হিসাব-নিকাশ চলছে। কারপরদাযের দায়িত্ব হবে হিসাব-নিকাশ করে তার ওসীয়্যত মঞ্জুর করে দেয়া। মরহুমার ছেলে আলী জবর সাহেব বলেন, আম্মা স্বয়ং রীতিমত তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। আর পরিবারের সদস্যদেরও তাহাজ্জুদ পড়ার নসীহত করতেন। সবসময় বলতেন, ঘুমের আনন্দকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগার বাসানায় রূপায়িত কর যেন তোমরা প্রমাণ করতে পার যে, তোমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ আনন্দ খোদার ইবাদতে নিহীত। আরও বলতেন, খোদার সাথে ভালবাসার বহিঃপ্রকাশের এই রীতিও অবলম্বন কর, ওযু করে প্রস্তুতি নিয়ে আযানের অপেক্ষায় বসে থাক যেভাবে নিজের একান্ত প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুলতার সাথে অপেক্ষায় থাক।

মুহাম্মদ শরীফ সাহেব তুরস্ক থেকে লিখছেন, হযরত রসূলে করীম (সা.) এবং মসীহ্ মওউদ (আ.), খলীফা এবং খিলাফতের সাথে আন্তরিক ভালবাসার কথা যখন তিনি বলতেন মানুষের ওপর অবশ্যই তার প্রভাব পড়ত। তার একান্ত বাসনা ছিল, আমরা যেন মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রত্যাশা অনুযায়ী জীবন যাপন করি। আলোচনাকালে তার কথা সবসময় কুরআনের আয়াত বা মহানবী (সা.)-এর হাদীস বা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথার মাধ্যমেই সমাপ্ত হত।

ফাতেমা জুমুআ সাহেবা লিখেন, যখন থেকে আমি বয়আত করেছি তিনি সবসময় আমার দেখাশোনা করেছেন। তিনি কখনো আমাকে অসহায় পরিত্যাগ করেন নি। যখনই কোন বাচ্চাকে কুরআন তিলাওয়াত বা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাসীদা পাঠ করতে দেখতেন তোহ্ফা বা উপহার দিয়ে তাকে উৎসাহিত করতেন। ফাতেমা সাহেবা আরো লিখেন, শেষবার যখন আমরা দেখা করতে যাই তিনি আমাদেরকে বলেন, আমি তোমাকে তাকীদপূর্ণ নসীহত করছি যে, সবসময় যুগ খলীফার কথা মেনে চলো। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যৎ

প্রজন্মকে সবসময় জামাতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন আর তাঁর বাসনা এবং ইচ্ছা অনুসারে তাঁর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন ইসলামের সত্যিকার সেবকে পরিণত হয় আর প্রকৃত ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।

দ্বিতীয় জানাযা মেক্সিকোর হাবিবা সাহেবার যিনি ২০১৫ সনের ১৯শে জানুয়ারি এক শতাব্দীর অধিক আয়ুষ্কাল লাভের পর ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ২০১৪ সনের জুন মাসে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। মরহুমা বৃদ্ধ বয়সে ইসলাম গ্রহণ করলেও এ বয়সেই তিনি নামায শিখেন এবং আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় তিনি রীতিমত নামায পড়তেন, দোয়াগো ও ইবাদতকারিণী ছিলেন। অজস্র ধারায় আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করতেন। প্রসন্ন মন-মানসিকতার অধিকারিণী ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে যোহরের নামায পড়েন। যিকরে ইলাহী করছিলেন, সেই অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। মেক্সিকোর ছিয়াপা রাজ্যের একটি গ্রাম লাক্সরুতে এক ক্যাথলিক ধর্মানুরাগী পরিবারে তার জন্ম হয়। তার পিতা নিজ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ পাদ্রী ছিলেন, তিনি ক্যাথলিক ধর্ম ছেড়ে দিয়ে প্রোটেস্টেন্ট দলে যোগ দেন। ১৯৮১ সনে ধর্মীয় বিরোধিতার কারণে তাকে হত্যা করা হয়। মরহুমার স্বামী তার পিতার জায়গায় এ ফিরকার পাদ্রী নিযুক্ত হন। ১৯৯৬ সনে তাঁর পৌত্র ইমাম ইবরাহীম সাহেব ইসলাম গ্রহণ করেন। আর তারই তবলীগে মরহুমার স্বামী এবং বংশের অধিকাংশ সদস্য আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তার সব পৌত্র-পৌত্রী এবং সন্তান-সন্ততি আহমদী মুসলমান। আল্লাহ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সবসময় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন এবং মরহুমার পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।